এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল কী বার্তা দেয়

মাছুম বিল্লাহ

: সোমবার, ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৩

২০২২ সালের ৬ নভেম্বর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয় এবং ওই বছরের ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরীক্ষা চলে। এতে ১২ লাখ ৩ হাজার ৪০৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। এবার ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখ ওই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায় সব বোর্ডে পাসের হার ৮৬ শতাংশ। গতবার এই হার ছিল ৯৫ দশমিক ২৬ শতাংশ। এক লাখ ৮৬ হাজার পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে, গতবার জিপিএ-৫ পেয়েছিল এক লাখ ৮৯ হাজার ১৬৯ জন। এবার মাদ্রাসা বোর্ডে পাসের হার ৯২.৫৬ শতাংশ, দ্বিতীয় কারিগরি শিক্ষাবোর্ড ৯১ দশমিক ২ শতাংশ। সাধারণ বোর্ডের মধ্যে কুমিল্লায় পাসের হার ৯০ দশমিক ৭২ শতাংশ। এইএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় এবারও পাসের হার ও জিপিএ-৫ পাওয়ার দিক দিয়ে এগিয়ে আছে মেয়েরা।

এবার ছেলেদের পাসের হার ৮৪ দশমিক ৫৩, আর মেয়েদের ৮৭ দশমিক ৮৪। এবার মোট জিপিএ-৫ পাওয়া ছেলেদের সংখ্যা ৮০ হাজার ৫৬১ এবং মেয়েদের সংখ্যা ৯৫ হাজার ৭২১ জন। গত বছরের তুলনায় এ বছর জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ১২ হাজার ৮৮৭ জন। বেড়েছে শতভাগ অকৃতকার্য প্রতিষ্ঠান, কমেছে শতভাগ পাস। শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে এক হাজার ৩৩০ প্রতিষ্ঠান থেকে। অন্যদিকে পরীক্ষায় ৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কেউই পাস করেনি। করেনার সময় সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ে পাসের হার যেখানে ৯৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল, করোনার পরের বছরই একই পরীক্ষায় ওই বিষয়ে পাসের হার নেমে এসেছে ৯০ শতাংশের নিচে। এতে

সার্বিক ফলাফলে পাসের হারসহ জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা কমেছে। সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের মধ্যে শুধু ঢাকা বোর্ডে ইংরেজি বিষয়ে পাসের হার ৯২.৩৩ এবং কুমিল্লা বোর্ডে ৯৪.৬৪ শতাংশ। এর বাইরে মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে ইংরেজি বিষয়ে পাসের হার ৯৫ শতাংশের উপরে।

উপরে অনেক সংখ্যার খেলা দেখা যাচ্ছে, আসলে এগুলো আমাদের কোনো মেসেজ দেয় কী? যেমন ২০২১ সালে পাসের হার ছিল ৯৫ দশমিক ২৬ শতাংশ, এবার তা কমে হয়েছে ৮৬ শতাংশ। এর কারণ কী? দেশে কী হঠাৎ কোনো হরতাল বা দুর্যোগ বা দুর্বিপাক ছিল যে গতবারের চেয়ে এবার এত কমসংখ্যক শিক্ষার্থী পাস করেছে? করোনা মহামারীর কারণে ২০২০ সালে এইচএসসি পরীক্ষা হয়নি। জেএসসি ও এসএসসির ফলের ভিত্তিতে মূল্যায়নে শতভাগ পরীক্ষার্থী পাস করে। ২০২১ সালেও একই কারণে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে পিছিয়ে ডিসেম্বরে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে গ্রুপভিত্তিক তিনটি নৈর্বাচনিক বিষয়ে ছয়টি পত্রে এইচএসসি পরীক্ষা হয়েছিল।

অর্থাৎ, ২০২১ সালে প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি, সব বিষয়ে মূল্যায়ন হয়নি। সব বিষয়ে মূল্যায়ন হলে পাসের হার কমে যেত। যেখানে মানের কথাটি আসে যেটি নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত নই বলে মনে হচ্ছে, আমরা শতভাগ পাস ছুঁই ছুঁই দেখতে পেলেই কেন যে আনন্দিত হই। প্রতি বছর এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর মানসম্মত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংকটের বিষয়টি আলোচনায় আসে। আমাদের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রদান করতে না পারায় মানবসম্পদ সৃষ্টিতে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। তাই যেনতেনভাবে গ্রাজুয়েটের সংখ্যা বাড়িয়ে সংখ্যাস্ফীতি দেখালে মানের জায়গা অধরাই থেকে যাচ্ছে। সেই বিষয়টিও কিন্তু খুব আলোচনায় আসছে না। আলোচনায় আসছে যারা পাস করেছে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের ভর্তির ব্যবস্থা হবে কিনা। এখন তো উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব নেই, অনেক প্রতিষ্ঠান কাঙ্ক্ষিত সংখ্যায় শিক্ষার্থীই পাচ্ছে না।

আরও দুই তিনটি পরিসংখ্যান যদি বিবেচনায় নিই তাহলে সে দুটির অর্থই বা কী দাঁড়ায়? একটি হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডে পাসের হার সর্বোচ্চ (৯২.৫৬ শতাংশ)। তার অর্থ কী এই যে, কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের অধীন ছেলেমেয়েদের তুলনায় মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের শিক্ষার্থীরা বেশি মেধাবী, কিংবা তারা আরবিও ভালো জানে, বাংলাও ভালো জানে কিংবা অন্যকিছু? এর কোন সদুত্তর নেই। একইভাবে পাসের হারে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে কারিগরি শিক্ষাবোর্ড (৯১.২ শতাংশ)। তারাও কি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার্থীদের চেয়ে অধিকতর মেধাবী কিংবা তারা কারিগরি শিক্ষায় বেশ পারদর্শী। তাদের দক্ষতা দ্বারা তারা দেশে কিংবা বিদেশে চমৎকার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিতে পারে? তারা প্রাকটিক্যালি অনেক ভালো? আসলে বিষযটি তাও নয়। দু-একজন ব্যতিক্রম ছাড়া দক্ষতার বাস্তব প্রয়োগে তারা অনেক পিছিয়ে। তাহলে এই ফল দ্বারা আমরা কী বুঝতে পারি, আমাদের জন্য এটি কী মেসেজ বহন করে? সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের মধ্যে পাসের হারে কুমিল্লা বোর্ড এগিয়ে আছে? কেন? কিভাবে? এর কি কোন সঠিক উত্তর আছে?

এবার বেশি শিক্ষার্থী ফেল করেছে গ্রামগঞ্জের বেসরকারি কলেজগুলোতে। ৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কেউই পাস করেনি যে সংখ্যা গতবার ছিল ৫টি। এটিরই বা কী অর্থ? একটি অর্থ হতে পারে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীরা অকাতরে নকল করার সুযোগ পেয়েছিল ২০২১ সালে, এবার হয়তো কোনো কারণে সেটি করতে পারেনি তাই এত প্রতিষ্ঠান ফেল করেছে। এছাড়া এর খুব একটা ভালো ব্যাখ্যা মেলানো যাচ্ছে না। প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক যা গতবার যেভাবে ছিল এবারও সেভাবেই আছে। তাহলে হঠাৎ এত প্রতিষ্ঠানের শূন্য পাস কেন? শূন্য পাস করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাজধানী ঢাকার কলেজও আছে। শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪টিই নয়টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের অধীন আর মাদ্রাসা বোর্ডের ৪টি, আর দুটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন।

সাধারণত গণিত, ইংরেজি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সম্প্রতিক সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা ভীত থাকে। এর প্রভাব পড়ে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলে। করোনার সময় সংক্ষিপ্ত সিলেবাস এবং কমসংখ্যক

বিষয়ে পরীক্ষা হওয়ায় কঠিন এই বিষয়গুলোর পাসের হর ওইভাবে চোখে পড়েনি কিন্তু করোনাকাল কাটিয়ে ওঠার পরই সেই বিষয়গুলোর চিত্র আবার সামনে চলে এসেছে বলে কেউ কেউ বলেছেন। এটি সত্যি কথা। ২০২১ সালে নেয়া হয়েছিল তিন বিষয়ে পরীক্ষা। ২০২২ সালের পরীক্ষায় বিষয় বাড়লেও তা হয়েছে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে। অর্থাৎ এটিও প্রকৃত মূল্যায়ন নয়। শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন বিভিন্ন বোর্ডে ইংরেজি প্রথম পত্রে প্রায় ১০ শতাংশ এবং দ্বিতীয় পত্রে ১৭ শতাংশেরও বেশি পরীক্ষার্থী ফেল করেছে।

বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা তিন বিভাগের পরীক্ষার্থীরাই ইংরেজিতে খারাপ ফল করায় সামগ্রিক ফলাফলে প্রভাব পড়েছে। এছাড়া অর্থনীতি প্রথম পত্রেও প্রায় ২১ শতাংশ শিক্ষার্থী ফেল করেছে। ইংরেজিতে শিক্ষার্থীরা গতবার খুব ভালো ছিল, এবার যারা এইচএসসি পরীক্ষা দিল তারা ইংরেজিতে খারাপ হয়ে গেল? পূর্বের বছরের শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে কথা বলতে পারতো, লিখতে পারতো, ইংরেজিতে যে কোন লেখা বুঝতে পারতো, এবারকার শিক্ষার্থীরা এসব দিক দিয়ে পিছিয়ে? বিষয়টি কি তাই? তাও তো না। তাহলে তফাৎ কেন? ইংরেজিতে শিক্ষার্থীদের সার্বিক কী অবস্থা, বোর্ড পরীক্ষায় ইংরেজিতে কী পরীক্ষা নেয়া হয় সবই তো আমাদের জানা। তাহলে এই পার্থক্যের কারণও কী ওই যে, দেখাদেখি করে আগের মতো লিখতে পারেনি?

উচ্চ মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করে শিক্ষার্থীরা উচচশিক্ষার বৃহত্তর জগতে প্রবেশের সুযোগ পায়, যা ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলে অনেক শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে বোঝা যায় বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থায় নানা ত্রুটি রয়েছে। এই ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তি নিয়ে শিক্ষার্থীর অভিভাবক, স্বজন ও সংশ্লিষ্টরা যতটা আগ্রহ প্রকাশ করেন, শিক্ষার মান নিয়ে তারা তার সিকিভাগের একভাগেও আগ্রহী নন। সংশ্লিষ্টদের মনোভাবে পরিবর্তন না এলে দেশের শিক্ষার মান কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাড়বে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ

থেকেই যায়। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুগোপযুগী শিক্ষার বিস্তারে যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে।

সাধারণত গণিত, ইংরেজি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সম্প্রতিক সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা ভীত থাকে। এর প্রভাব পড়ে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলে

একজন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেলে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না সে কতটা সৃজনশীল, কতটা প্রবেলম সলভিং দক্ষতা সে অর্জন করেছে, সে রাস্তার ট্রাফিক আইন মেনে চলে কিনা, তার সহযোগী মনোভাব আছে কিনা, সে সহপাঠীদের সঙ্গে, ছোটদের সঙ্গে, বড়দের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হয় তা জানে কিনা, সে কতটা সৎ ও দেশপ্রেমিক। অথচ এগুলো সবই বাস্তবজীবনে খুবই প্রয়োজন যে জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। জীবনে এগিয়ে যেতে কাজে লাগে, এগুলো জীবনে সাফল্য অর্জনের হাতিয়ার। সমাজে যত ছোট বড় উদ্যোক্ত হয়েছেন, প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছেন, অন্য মানুষের জন্য কাজের ব্যবস্থা করেছেন তাদের অধিকাংশরেই এইসব গুণ ছিল এবং আছে। আর যারা শুধু পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে ব্যস্ত ছিল তাদের কিন্তু এসব কাজ করতে দেখা যায় না। বরং তারা ওইসব প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য ছোটাছুটি করে। দুঃখ প্রকাশ করে অনেকে বলেও থাকেন যে, শিক্ষিত মানুষের দাম নেই, দাম হয়েছে অশিক্ষিত ছেলেমেয়ে যার ক্লাসের পেছনে থাকত। আসলে ঘটনা তো তা নয়। তারাই প্রকৃত শিক্ষিত, তারাই সমাজের প্রকৃত উপকার করছে। আর যারা শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা আর নম্বর পাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকত তারা সমাজের জন্য, মানুষের জন্য খুব একটা কিছু করতে পেরেছে এমন দৃশ্য বিরল উদাহরণ ছাড়া সচরাচর দেখা যায় না।

[লেখক: শিক্ষা বিশেষজ্ঞ]